২৪-০৮-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানসাগর বাবা আর ব্রহ্মা-পুত্র নদের এই মিলনের সঙ্গম হীরে তুল্য। তোমরা বাচ্চারা এখানে আসো, নগণ্য কানাকড়ি থেকে হীরের তুল্য মূল্যবান হতে"

প্রশ্ন :- সত্যযুগের রাজধানী স্থাপনা কবে আর কিভাবে হবে ?

উত্তর :- বর্তমানের এই পুরানো দুনিয়ার পতিত সৃষ্টির বিনাশ হয়ে যখন পুরোপুরি ভাবে পরিস্কার হয়ে যাবে তারপরেই সত্যযুগের রাজধানী স্থাপনা হবে। তাই, এর পূর্বেই তোমাদের তৈরী হতে হবে, অর্থাৎ পবিত্র হতে হবে। নতুন রাজধানীর অব্দ বা যুগ শুরু হয়, যখন সেই দুনিয়ায় একজনও কেউ পতিত থাকে না। কিন্তু, এই পতিত দুনিয়া থাকাকালীন নতুন অব্দের শুরু হবে না। যদিও তখন রাধা-কৃষ্ণের জন্ম হয়ে যাবে, কিন্তু সেই সময়কে সত্যযুগ বলা যাবে না। সত্যযুগ বলা যাবে সেই সময়কে - যখন ওনারা লক্ষ্মী-নারায়ণ রূপে রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবেন। তখন থেকেই অব্দ বা যুগ শুরু হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মাদের আসা-যাওয়া চলতেই থাকবে। এসব বিষয়গুলিই বিচার সাগর মন্থন করার ব্যাপার।

গীত :- এটাই তো বসন্ত-বাহারের উত্তম সময়, এই পুরোনো দুনিয়াকে ভোলার .....

ওঁম্ শান্তি ! বাচ্চারা, তোমরা কোথায় এসেছো ? -জ্ঞান-সাগরের তীরে। তোমরা জ্ঞান-গঙ্গার কিনারা থেকে এখন এসেছো জ্ঞান-সাগরের তীরে। তোমরা কারা এসেছো ? -জ্ঞান গঙ্গারা। কি হবার উদ্দেশ্যে এসেছো ? -নগন্য কানাকড়ি থেকে মহা মূল্যবান হীরে হতে অথবা ভিখারী-কাঙ্গাল থেকে হীরের মুকুটধারী রাজা হবার জন্য। ইঁনি ব্রহ্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম-পুত্র নদ আর শিববাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। এই ব্রহ্মা নদই শিববাবার পুত্র আর যেহেতু তোমরা ব্রহ্মাবাবার সন্তান, তাই তোমরা সবাই শিববাবার নাতি-পুতি। কলকাতার কাছে (গঙ্গাসাগরে) সাগর আর নদীর সঙ্গম স্থলে বিশাল মেলা বসে। সেখানে একত্রে গঙ্গা নদী, ব্রহ্ম-পুত্র নদ ও সাগরের মিলন হয়। যদিও ব্রহ্ম-পুত্র নদের সাথে আরও অনেক নদীর মিলন হয়। কিন্তু, প্রধান মিলন হলো ব্রহ্মপুত্র আর সাগরের মিলন। তাই সেখানকার নাম রাখা হয়েছে ডায়মন্ড হারবার (হীরা তুল্য আশ্রয়স্থল)। যদিও এই নাম রেখেছে ইংরেজরা। তারা এর প্রকৃত অর্থটাই জানে না, অথচ নামটা কিন্তু ঠিকই রেখেছে। বাবা তোমাদেরকে সেই নামেরই অর্থ বিশ্লেষণ করে বোঝাচ্ছেন। তোমরা এখন এসে বসে আছো, ব্রহ্মপুত্র আর জ্ঞান-সাগরের সম্মুখে । তোমরা নিজেরাও সেই প্রাকৃতিক সাগরের কাছে যাও, হীরে তুল্য হওয়ার লক্ষ্যে - কিন্তু বাস্তবে হীরে তুল্য হওয়ার বদলে কেবল পাথর তুল্যই হয়ে যাও। যেহেতু সেখানে কেবল ভক্তি-মার্গের রীতি-নীতি। প্রকৃত অর্থে এই সঙ্গম আত্মাদের সাথে পরমাত্মার। একে অপরের সাথে মিলিত হয়। কিন্তু ঐ মিলন হলো জড়ের-মিলন আর এই মিলন চৈতন্যের। চৈতণ্যের এই মিলন তো যে কোনও স্থানেই হতে পারে। অতএব বাচ্চারা, সর্বদাই তোমাদের বুঝতে হবে, এখানে ব্রহ্ম-পুত্র আর সাগর চৈতন্য রূপে দুজনেই একত্রিত। সত্যি, এই সঙ্গমেই এমন হীরে তুল্য হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। অতএব বাচ্চারা তোমরাও হীরের মতন হও। এখানকার এই মেলা ব্রহ্মপুত্র আর তার পালিত জ্ঞান-গঙ্গাদের মিলন মেলা। আর তা আবার অসংখ্য নদীর। যা তোমাদের সবারই জানা আছে। ভারতে কত অগুনিত নদীর প্রবাহ। যা অসংখ্য সংখ্যায়। কিন্তু তোমরা সেইসব জ্ঞান নদীর কুল-কিনারাও খুঁজে পাবে না। এখন হচ্ছে সেই সময়, যখন এই জ্ঞান নদীরা

সাগর থেকে সৃষ্টি হয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে। যার শুরুতেই ব্রহ্মপুত্রের সৃষ্টি হয়, তারপর তার থেকেই এইসব ছোট-ছোট নদী বেরোতে থাকে। তোমরা এও জানো যে, এসবকিছুই ঘটে তোমাদের পুরুষার্থের আধারের ক্রম-অনুসারে। যেমন হীরের টুকরা কোনওটা বড় হয় তো কোনওটা আবার ছোট আকারের, কিন্তু সবগুলিই তো হীরে। ঠিক তেমনি তোমরাও সব বাচ্চারাই এখানে হীরে তুল্যই হও। তবে এমনও বলা যায় না যে, সবাই সূর্য-বংশীয় মহারাজা-মহারাণী হবে। না তেমনটা সবাই হয় না। কিন্তু তবুও যেমন রাজা-রাণী, প্রজারাও তেমনি। তোমাদের প্রত্যেকেরই জীবন-যাত্রার মান হীরে-তুল্যই হয়। সত্যযুগের সেই স্বর্গ প্রাপ্তির লক্ষ্যে, যে আত্মা সামান্যতমও পুরুষার্থ করে, সে অবশ্যই হীরে-তুল্যই হয়। এই ব্রহ্মপুত্র নদ আর সাগর দুজনেই কিন্তু একত্রিত। যেমন তোমরা বাচ্চারা যখন এখানে আসো, তখন তোমাদের মনের ভিতরে এই ভাব থাকে যে, তোমরা বাপদাদার কাছেই যাচ্ছো। জ্ঞান-সাগর বাবা স্বয়ং প্রবেশ করেন ব্রহ্মপুত্রের ভিতরে - অর্থাৎ ব্রহ্মার শরীরে। বাবা এই ব্রহ্মার দ্বারাই আমাদেরকে হীরে-তুল্য বানায়। এখন এটা নির্ভর করে তোমাদের উপর। তোমরা কে কতটা বাবার শ্রীমত অনুসারে চলে, কতটা পুরুষার্থ করবে, তা তো তোমাদের উপরেই নির্ভর করছে।

তোমাদের এও জানা আছে যে, যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন পুরুষার্থ করে যেতে হবে। সে অনুসারে রোজই তোমরা পাঠও পেতে থাকো। আর এই পাঠের রেজাল্ট বা ফল বুঝতে পারবে বিনাশের সময়েই। একদিকে পরীক্ষার ফল অপরদিকে ভয়ঙ্কর বিনাশের লীলাখেলা শুরু। চারিদিকে হা-হা কার রব। যা সেভাবে প্রকাশই করা যায় না। তাই সেই বিনাশ পর্বের পূর্বেই অর্থাৎ মহা-যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই নিজেদেরকে তৈরী করতে হবে। এখনই তোমাদের এটাও আন্দাজ করতে হবে, আর কতটুকু সময়ই বা অবশিষ্ট আছে। তোমরা তো এও জেনেছো যে, নতুন রাজধানী স্থাপনার কার্য শুরু হবার পূর্বেই বর্তমানের এই দুনিয়ায় যা কিছু, সবই তা জঞ্জাল। অতএব সেসবের পরিস্কার তো হতেই হবে। আর তোমরা তা জানো বলেই পবিত্রতার এই ব্রতে ব্রতী হয়েছো। বাকীরা যারা তারা তো পতিত-ই থেকে যাবে। অবশ্য সব পতিতরাই ধ্বংস হবে। তারা তাদের কর্মফল ভোগের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে তবেই ঘরে ফিরতে পারবে। এই দুনিয়াতে যখন একজনও পতিত থাকবে না, তখনই তাকে পবিত্র দুনিয়া বলা যাবে। যেমন তোমরা এই সময়ে পবিত্র, কিন্তু সমগ্র দুনিয়াটা তো আর পবিত্র নয়। অবশ্য পবিত্র তো তাদেরকেও হতে হবে। যখন বিনাশ হবে, তারপর তো সমগ্র দুনিয়াই পবিত্র হবে। তবেই তো তাকে নতুন দুনিয়া বলা যাবে। নতুন দুনিয়ার অব্দের বিষয়ে কেউ জানতে চাইলে, তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, যখন অভিষেকের মাধ্যমে মহারাজা-মহারাণী তাদের রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠান করেন তখন থেকেই নতুন অব্দের সূচনা হয়। যতক্ষণ না নতুন অব্দের শুরু হয়, ততদিন পর্যন্ত বর্তমানের এই পুরোনো অব্দই বজায় থাকে। এখন থেকেই কিন্তু নতুন অব্দ শুরু হবে না। যদিও তোমরা ব্রাহ্মণেরা তো নতুন অব্দের। কিন্তু দুনিয়াটা অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর সব কিছুই তো আর নতুন নয় !

বর্তমান সময়কালটা নতুন ও পুরানো এই দুয়েরই সঙ্গম। কলিযুগের শেষে সত্যযুগ তো অবশ্যই আসবে। আমরা তো বলেই থাকি, (কল্পের) প্রথম রাজকুমার-রাজকুমারী অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণ, তবুও সেই সময় কালকে সত্যযুগ বলা যাবে না। যতক্ষণ না লক্ষ্মী-নারায়ণ তাদের রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না হন, ততদিন পর্যন্ত কিছু না কিছু সংঘাত-দ্বন্দ্ব চলতেই থাকবে। যদিও তখন রাধা-কৃষ্ণের উপস্থিতি থাকে এই একই দুনিয়ায়। দেখো বাচ্চারা, এসবেরই বিচার-সাগর মন্থন করতে

হবে তোমাদেরকে। যখন সত্যযুগ শুরু হবে তখন থেকেই অব্দের শুরু। যেমন সূর্য-বংশীদের রাজত্বকাল এই সময়কাল থেকে অতটা সময়কাল পর্যন্ত। সেক্ষেত্রে কিন্তু রাজা-রাণীর নাম অনুসারে অব্দ কখনই হয় না। এর মধ্যবর্তী সময়ে অনেকেরই আসা-যাওয়া চলতে থাকে। নোংরা ছিঃ ছিঃ মানুষদের চলে যেতেই হবে সেই দুনিয়া থেকে। খুব অল্প সংখ্যক মানুষ অবশ্য বেঁচে থাকবে। এরকম যারা বেঁচে থাকবে, তাদেরকেও একসময় ফিরে যেতে হয়, অবশ্য এতে সময় কিছুটা লাগে। কিন্তু কে তোমাদেরকে এসব ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন ? -জ্ঞানের সাগর বাবা স্বয়ং এবং ব্রহ্মপুত্র জ্ঞান নদ দুজনেই একসাথে তোমাদের তা বোঝাচ্ছেন। যেহেতু দুজনেই এখন একত্রিত।

প্রতি বছরেই তো জাগতিক কুম্ভ-মেলা উৎসব পালিত হয়। কিন্তু এই জ্ঞানের কুম্ভ-মেলা অর্থাৎ সাগর আর জ্ঞান নদীদের মেলা কেবল এই সঙ্গম যুগেই হয়ে থাকে। আবার তোমরা বাচ্চারা বলে থাকো, "আমরা যাচ্ছি মাতা-পিতা বা জ্ঞান সাগর আর বিশাল নদের কাছে। (শিব) বাবা আমাদেরকে এই বিশাল নদ ও অন্যান্য বড় নদীর মাধ্যমে, আমাদের অর্থাৎ নদীদের আশীর্ব্বাদী-বর্সা দেন। যার দ্বারা আমরা হীরে তুল্য হতে পারি। কত আনন্দে আর কত শুদ্ধতার সাথে কুম্ভ মেলায় যায় লোকেরা। তখন তাদের মানসিক ভাবনা-চিন্তা, বাক্য-প্রয়োগ ও ক্রিয়া-কর্ম কত সুন্দর ও পবিত্র থাকে। যদিও তা জাগতিক তীর্থ-যাত্রা। তীর্থের যাত্রীরা প্রত্যকেই যে যার নিজের কল্যাণ করতেই চায়। পাণ্ডাদেরও কিন্তু তত কল্যাণ হয় না, যতটা হয় তীর্থ-যাত্রীদের। পাণ্ডারা তো যাত্রীদের থেকে পাওয়া টাকা-পয়সা জড়ো করে তা সামলাতেই ব্যস্ত থাকে। তাদের তেমন ভক্তি থাকে না, যতটা থাকে তীর্থ-যাত্রীদের। তীর্থ-যাত্রীরা তো কেবল তাদের শুদ্ধ ভাবনাতেই থাকে। তাই তাদের মধ্যে কারও কারও আবার ইষ্ট দর্শণও হয়ে থাকে। অমরনাথে যে বরফের লিঙ্গ বানানো হয়, সামনে গেলেই তা শুধুই বরফের এমনটাই মনে হয়। কিন্তু ভক্তির ভাবনায় যে যেমন ভাবে সে তেমনই দেখে। তাতেই সে যথেষ্ট খুশীও হয়ে যায়। তাদের ভাবে, বাঃ প্রকৃতির কি আশ্চর্য লীলা! মানুষের মনে এই বিশ্বাস হয়ে যায় যে, বরফের এই লিঙ্গরূপ নিজের থেকেই গঠিত হয়। আসলে তা কিন্তু তেমন কিছু নয়। তোমাদের প্রকৃত তীর্থ-যাত্রা তো এখন শুরু হয়েছে। মানুষেরা ভাবে, ভগবানের সাথে মিলিত হবার জন্য বা দর্শণ করতে গেলে কতই না ধাক্কা-ধাক্কি আর ঠোকর ইত্যাদি সহ্য করতেই হবে। এতদিন ধরে তো পরম্পরায় এভাবেই চলে আসছে। তবুও কিন্তু তারা কোথাও প্রকৃত ভগবানের সাক্ষ্যাৎ পেল না। বাবা তাই ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন, ভগবানের কোনও চিত্রই হয় না। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আলোক বিন্দুর ফটোই বা হবে কি প্রকারে ? উদাহরণ রূপে বোঝাবার জন্য যা বলা হয়ে থাকে, ভগবান এক উজ্জ্বল নক্ষত্র-জ্যোতিষ্কের মতন। দুই ভ্রুকূটির মধ্যিখানে সেখানেই দীপ্তিমান স্ফুলিঙ্গের অবস্থান। সেই চিহ্নের স্মৃতিতে কন্যারা নিজেদের ভ্রুকূটিতে তিলক ধারণ করে। যেহেতু তারা শুনেছে আত্মার অধিষ্ঠানের স্থান ভ্রুকূটি, তাই সেস্থানে তারা জাতীয় কোনও অতি ক্ষুদ্র চিহ্ন লাগায়। প্রকৃত তিলক যদি বলতেই হয় তো তাই। আর রাজ-তিলক কিন্তু অনেকটাই বড়। যেহেতু রাজ-তিলক হচ্ছে স্থুল তিলক। বাচ্চারা, তোমাদের তো এখন সে জ্ঞান হয়েছে, আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের এভাবেই সেই রাজতিলকের প্রাপ্তি হবে। আত্মারা তা অনুভবও করে, পরমপিতা পরমাত্মা থেকে এভাবেই তারা তাদের সেই তিলক পেয়েই চলেছে। ভ্রুকূটির মধ্যিখানেও সেই অপূর্ব তারার অনুভূতিও পায় আত্মারা। তাই সেখানে তারা সোনার তিলকও লাগায়। তোমরা তো এখন এই জ্ঞানে যথেষ্টই সমৃদ্ধ হয়েছো। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের এবার হীরে-তুল্য হতে হবে। আমরা আত্মারাও তারারই মতন। পরমপিতা পরমাত্মাও অতি ক্ষুদ্র এক

তারার মতনই। কিন্তু তিনি জ্ঞানের সাগর, তাই ওনার মধ্যে জগতের সব জ্ঞানই পরিপূর্ণ। যা অতি গুহ্য-রহস্যময় বিষয়।

তোমারা জ্ঞান অর্থাৎ আলোর দিশা পেয়েছো। পরমপিতা পরমাত্মার প্রকৃত রূপকেও দেখেছো, জেনেছো, আলোর দিশাও পেয়েছো। যেভাবে আত্মার অনুভব হয়, ঠিক সেভাবেই পরমপিতা পরমাত্মারও অনুভূতি হয়। বাবাও তাই বলেন, যেমন তুমি আমিও তেমনি। এরপর বাবার কাছ থেকে বাচ্চাদের আর কি বা সাক্ষ্যাৎকারের দরকার। আত্মার মধ্যে ছোট-বড় কিছু হয় না। যেমন তুমি তেমনি তোমার বাবা। সেক্ষেত্রে কেবল মহিমা আর কর্ম-কর্তব্যের তফাৎ ও ভিন্ন গুণ ও প্রকৃতির থাকে। আর বাবার পার্ট থাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। আত্মাদেরও তাদের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট ভিন্ন-ভিন্ন প্রকৃতির হয়। যেমন সব অভিনয়কারীর পার্ট একই প্রকার হয় না। একের সাথে অপরের পার্টে কোনও মিল থাকে না। আবার দুজনেই একই অভিনয় করতেও পারে না। একেই ঈশ্বরের চমৎকার বলা হয়। বাস্তবে এই অবিনাশী নাটককেই আশ্চর্যের বলা চলে। বাবা নিজেও তা প্রকাশ করেন না যে, এই নাটকের রচয়িতা উঁনিই। তখনই প্রশ্ন ওঠে, তবে এই অবিনাশী নাটক কবে, কখন বানানো হয়েছিল ? যাকে প্রকৃতির আশ্চর্য বলা হয়। এই নাটকের পটচিত্রই বা কিভাবে ঘুরতে থাকে, -সেসব তো তোমরা সবই জানো। এত ক্ষুদ্র তারার মতন আত্মাতে কত লম্বা পার্ট ভরা থাকে।

সর্ব্বশক্তিমান পরমপিতা পরমাত্মা উঁনিই বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ-কর্তা। উঁনিই আবার জ্ঞানেরও সাগর। জগতে আর কারওকেই জ্ঞানের সাগর বলা চলে না। যেমন বেদ-শাস্ত্র যারা শোনায়, তারা তো কেবল শাস্ত্রের জ্ঞানই শোনায়। কিন্তু বাবার ভান্ডারে যে অফুরন্ত জ্ঞান আছে, তা আর কারও কাছেই নেই। একমাত্র ভগবান যিঁনি স্বয়ং এসে এই সহজ রাজযোগ আর জ্ঞানের শিক্ষা দেন। তাই তো একমাত্র ওঁনাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। আর সেই কারণেই এখানকার সঙ্গমে নদীদের মেলা বসে।

তোমরা তো জানোই, সাগর থেকেই নদীর উৎপত্তি। কোনও কোনও বাচ্চা অবশ্য এটাও জানে না। ঠিক একই প্রকারে তোমাদের কথাও জগতের লোকেরা সেভাবে বুঝতে পারে না। জ্ঞান-সাগর কিভাবেই বা আসেন, জ্ঞান গঙ্গারা ওনার থেকে কিভাবেই বা জ্ঞান পায়- এসবই বিশেষ জ্ঞানের বিষয়। মানুষেরা মানুষের দ্বারা প্রাপ্ত কথায়, যা একবার বুদ্ধিতে বসে গেছে, তাকেই সত্যি ভেবে নেয়। প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে তারা আদৌ অবগতও নয়। কিন্তু তোমরা এখন সেই সাগর আর এই জ্ঞান সাগরকে বুঝতে পেরেছো। প্রাকৃতিক সাগর আর নদীগুলি তো কেবল দুঃখই দিতে থাকে। সাগর উথলে উঠলে, বন্যায় কত লোকসানও হয়ে থাকে। তখন কিন্তু সবাই এই জ্ঞান-সাগর পতিত পাবনেকেই ডাকতে থাকে। প্রাকৃতিক সাগর বা নদীকে কেউ ডাকে না। কেবলমাত্র পতিত পাবন জ্ঞান সাগরকেই ডাকতে থাকে। তোমরা নদীরাও সেই জ্ঞান-সাগর থেকেই বেরিয়েছো। এই জ্ঞান-সাগরের নাম-রূপ-দেশ-কালকে কেউ জানেই না। যদিও তাকেই তারা 'শিব'-নামে ডাকে। তার সাথে তারা আবার লিঙ্গ নামেরও যোগ করেছে। কিন্তু বাবার তো অবিনাশী। এই শিববাবাই একমাত্র রচয়িতা। ওনার রচনাও কেবল একটাই, যা অনাদি। বাবা স্বয়ং বসে তা বোঝান, কিভাবে তা অনাদি। সত্যযুগে এইসব উৎসব ইত্যাদি কিছুই হয় না সেখানে। এসব তখন গুপ্ত হয়ে যায়। আবার ভক্তি-মার্গ শুরু হলে ধীরে ধীরে সেগুলির প্রচলন হয়। মানুষেরা ভাবে, স্বর্গ-রাজ্য অবশ্যই কখনও ছিল, আবার কোনওদিন তা ফিরেও আসবে। কিন্তু বর্তমানের এই দুনিয়ার এখন যা নরক অবস্থা।

এর প্রকৃত আয়ুও তাদের কারও জানা নেই। যেহেতু তারা এখন ঘোর অন্ধকারে আছে। এমন কি কল্পের প্রকৃত আয়ুও কারও জানা নেই। তাই তারা এমনও বলে যে, এই অবিনাশী নাটকের চিত্রপট তার নির্দ্দিষ্ট নিয়মেই ঘুরতে থাকে। কিন্তু, যেহেতু তারা তার সঠিক সময়কালকেই জানে না, তাই সঠিক কিছুই তারা বুঝে উঠতে পারে না। এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাবা স্বয়ং অধিষ্ঠান হয়ে ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারা সকল বেদ-শাস্ত্রের সার বসে বসে বোঝাতে থাকেন। আর সেই কারণেই লোকেরা ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেখায়। প্রকৃতপক্ষে এত ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের সব শাস্ত্র কেউ একা তার হাতে ধরে রাখতে পারে ? কিম্বা ব্রহ্মার দ্বারও কি সর্ব প্রকারের শাস্ত্র শেনানো সম্ভব ? তোমরা নিজেরাই তা বুঝতে পারছো! এমন অবাস্তব সব কিছুই ভক্তি মার্গের ধারণা মাত্র। তোমরা তো সেসবই পড়াশোনা করে এসেছো এতদিন। লোকেরা এটাও তো জানে না তারা কবে থেকে এসব পাঠ পড়ে আসছে। যদিও কোনও কিছুই সঠিক জানে না তারা, তবুও বলে, এসব তো অনাদি কাল ধরেই চলে আসছে। বেদ-শাস্ত্রের রচনাকার ব্যাসদেব। এই বেদ গ্রন্থকেই তারা সর্ব্বোচ্চ গ্রন্থ বলে থাকে। কিন্তু একথা স্পষ্ট রূপে লিখিত আছে যে, বেদ শাস্ত্র সমেত সব ধর্ম-গ্রন্থই গীতা থেকেই রচিত হয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা তো এখন জানতে পেরেছো, এই বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি আবার নতুন করে রচিত হবে। আবারও তার সেই একই নাম হবে।

তোমরা এও জানো যে, তোমরা আবারও পূজ্যতে রূপে পরিণত হচ্ছ, এরপর পূজারী হয়ে মন্দির ইত্যাদির নির্মাণ করবে। রাজা-রাণীরাই যদি মন্দির নির্মাণ করায়, সেখানে প্রজারাও তো তাই করবে। ভক্তিমার্গ শুরু হলেই সবাই মন্দির বানাতে শুরু করবে। এমন কি তারা ঘরে ঘরে প্রতি ঘরেই মন্দির বানাতে থাকবে। কিন্তু লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানীতে তো আর রাধা-কৃষ্ণের মন্দির বানানো যেতে পারে না। মন্দির নির্মাণ শুরু তো হয় ভক্তি মার্গ থেকে। যেমন যেমন আত্মাদের কলা, গুণ ও শক্তি কমতে থাকে, সেই অনুযায়ী তত বেশী করে মন্দির নির্মাণ হতে থাকে। সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশীদের বিপুল ধন-সম্পত্তি ভোগের পর যা অবশিষ্ঠ থাকবে, তা বৈশ্যবংশী ও শূদ্রবংশীরা ভোগ করবে। তা না হলে তারা তা পাবেই বা কোত্থেকে। ধন-সম্পদের স্থান সর্বদাই পরিবর্তন হতেই থাকে। বড়-বড় সম্পত্তি যেমন ছোট হতে হতে অবশেষে একসময়ে কিছুই তার আর অবশিষ্ঠ থাকে না, তখন তারা নিজেদের মধ্যেই ভাগাভাগি শুরু করে। অতএব বাচ্চারা, এখন তো তোমরা বুঝতে পেরেছো, কিভাবে তোমরা পূজ্য ছিলে। কতদিন তোমরা পূজ্য থাকো, তারপর কিভাবেই বা পূজারীতে পরিণত হও। এখন তো বোধগম্য হয়েছে, পরমপিতা পরমাত্মার নাম-রূপ-দেশ-কাল আর ওনার কর্ম-কর্তব্যের পার্ট-ই বা কি। ভক্তি মার্গেও ভক্তদের শুদ্ধ ভাবনাকে এই বাবাই পূর্ণ করেন। আর অশুদ্ধ ভাবনা পূরণ করে রাবণ। জ্ঞান সাগর বাবা সমস্ত জ্ঞানই তোমাদের বুদ্ধিতে বসিয়ে দিয়েছেন। যদিও সবাই তা সেভাবে বুঝবে না। কল্প পূর্বে যে যেমন বুঝেছিল, এখনও তারা সেভাবেই তা বুঝবে। আচ্ছা !

মিষ্টি- মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণে ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় সন্তানদের তাদের ঈশ্বরীয় পিতা জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত পুরুষার্থ করে যেতে হবে। বাবার দেওয়া এই অমূল্য শিক্ষার অভ্যাসে অভ্যাসী হতে হবে। বাবার মতনই মাস্টার জ্ঞান-সাগর হতে হবে।

২) ঈশ্বরীয় পান্ডা হয়ে সবাইকে প্রকৃত তীর্থ-যাত্রার দিশা দেখাতে হবে। নিজেকে যেমন হীরে তুল্য তৈরী করবে, অন্যদেরও তেমনি ভাবেই তৈরী করতে হবে।

বরদান :- সাক্ষীভাবের অচল আসনে বিরাজমান থেকে অচল-অটল ও প্রকৃতিজীত হও

বিস্তার :- যদিও প্রকৃতিতে অস্থিরতা আসে, কিম্বা প্রকৃতি তার অপূর্ব খেলা দেখাতে থাকে - এই দুই অবস্থাতেই প্রকৃতিপতি আত্মারা সাক্ষীভাবে থেকে সেই খেলা দেখতে থাকে। তা সে যেমন খেলাই হোক - আর তা দেখতেও মজাই লাগে, কিন্তু ঘাবরায় না। যে নিজের তপস্যার দ্বারা সাক্ষীভাবের স্থিতিতে অচল আসনে বিরাজমান থাকার অভ্যাস করে, প্রকৃতি কিম্বা ব্যক্তি তাকে কোনও প্রকারেই নাড়াতে পারে না। প্রকৃতির ৫ আর মায়ার ৫ খেলোয়ারেরা নিজেদের খেলা নিজেরাই খেলতে থাকবে, তখন তা কেবলমাত্র সাক্ষী হয়ে দেখতে পারলে তখনই বলা যাবে অচল, অটল, প্রকৃতিজীত আত্মা।

স্লোগান :- মন-বুদ্ধিকে একমাত্র বাবার প্রতি একাগ্র করতে পারা আত্মাই পূজ্য-আত্মা হতে পারে।